

ଅଧ୍ୟାୟ ୫ ଅଗୁଜୀବଜଗତ

অধ্যায় ৫

অণুজীবজগৎ

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ✓ অণুজীব, অণুজীবজগতের শ্রেণিবিভাগ
- ✓ কিছু সাধারণ অণুজীবের পরিচয়
- ✓ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া
- ✓ ছত্রাক, শৈবাল ও অ্যামিবা
- ✓ জীবের ভেতর বসত করা অণুজীব

প্রথমেই একটি মজার খাবারের কথা দিয়ে শুরু করা যাক। তোমরা নিশ্চয়ই দই (Yogurt) খেয়েছ, যে কোনো বড় মুদি দোকান কিংবা মিষ্টির দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেও দেখবে তাদের কাছে দই আছে। ঘরেও আমাদের অনেকের মা-বাবা কিংবা বড় ভাই-বোনরা দই বানাতে পারে। কীভাবে দই তৈরি করা হয় জানো? যারা দই তৈরি করেন, তারা হয়তো বলবেন, দুধ থেকে দই তৈরি হয়। তাদের কথায় ভুল নেই। কিন্তু দুধ থেকে দই তৈরির পেছনে কিন্তু অদৃশ্য কারিগরও আছে, যেগুলোকে আমরা দেখতে পাই না। সেগুলো তরল দুধকে পরিবর্তন করে দই বানিয়ে ফেলে। এই অদৃশ্য কারিগর আর কেউ নয়, এক (বা একাধিক) ধরনের অণুজীব। এই অধ্যায়ে আমাদের খালি চোখে দেখা যায় না যে বিস্ময়কর অণুজীবজগৎ, সে সম্বন্ধে জানব।

আমাদের চারপাশে আমরা ছোট-বড় অনেক জীব দেখতে পাই। এগুলোর কেউ উদ্ভিদ, কেউ প্রাণী। এগুলোকে খালি চোখে দেখা যায়। এগুলোর বাইরে জীবগতের যে অংশকে আমরা খালি চোখে দেখি না, তবে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার করে দেখা যায়, তা-ই অণুজীবজগৎ। আমাদের চারপাশের সর্বত্র এই অণুজীবজগতের বিস্তার। ঘরের বা স্কুলের আঙ্গিনার সামান্য একটু মাটিতেও থাকতে পারে লক্ষ লক্ষ অণুজীব, যা কেবল অণুবীক্ষণযন্ত্রেই দেখা যাবে। এগুলো যে কেবল আকারে ছোট তা-ই নয়, বরং এসব অণুজীবের গঠনও ভিন্ন। অনেক অণুজীব কেবল এককোষী, অর্থাৎ কেবল একটি কোষ নিয়েই গঠিত। কিন্তু কিছু অণুজীব বহুকোষ বিশিষ্ট হতে পারে। কিছু অণুজীবে নির্দিষ্ট কেন্দ্রিকা বা নিউক্লিয়াসযুক্ত সুগঠিত কোষও থাকে না। নিউক্লিয়াস সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত জানব তবে এখন জেনে রাখি যে, নিউক্লিয়াস কোষের সব ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

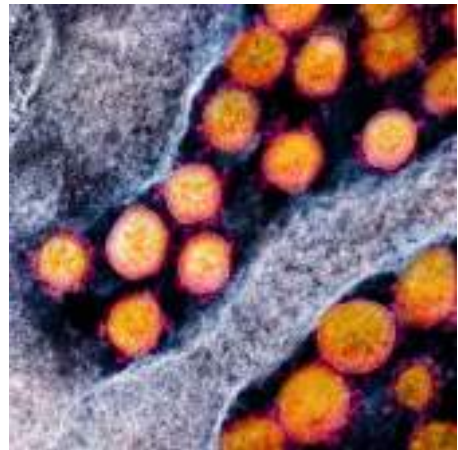
অণুজীব তুলনামূলকভাবে সরল গঠনের হয়। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, বিবর্তনের ধারায় (জটিল জীবের তুলনায়) আগে পৃথিবীতে এসব অণুজীবের উদ্ভব হয়েছে। তাই অণুজীবকে আদিজীবও বলা হয়ে থাকে। আমরা আগের শ্রেণিতে অণুজীবজগতের সদস্যদের কথা খানিকটা পড়েছি। সেখানে আমরা

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, এগুলোর কথা জেনেছি। এগুলো সব এক ধরনের অণুজীব। আমরা আরো বিস্তারিতভাবে এই অধ্যায়ে অণুজীব নিয়ে জানব।

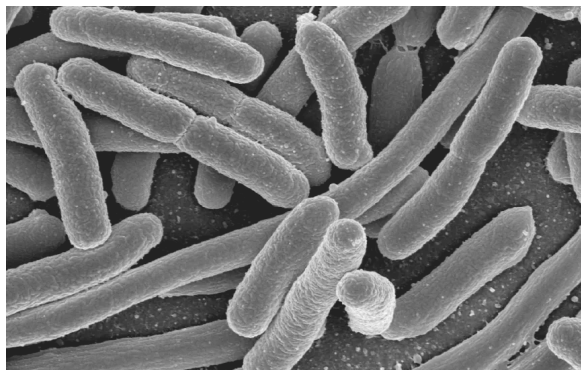
অণুজীবজগতের শ্রেণিবিভাগ

অণুজীবজগতের শ্রেণিবিভাগ করার সময়ে এগুলোর আকার এবং এগুলোর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এসব বিবেচনায় অণুজীবজগৎকে মূলত তিনটি রাজ্যে ভাগ করা হয়। ভাগগুলো হচ্ছে,

রাজ্য-১: এক্যারিওটা বা অকোষীয়। এসব অণুজীব এতটাই ছোট যে, সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচেও এগুলোকে দেখা যায় না। এগুলো দেখতে বিশেষ অণুবীক্ষণ যন্ত্র যা দিয়ে অতীব ক্ষুদ্র জিনিস দেখা যায় (Electron microscope) তার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ: ভাইরাস।



ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা SARS-CoV-2 ভাইরাস, যা করোনাভাইরাস নামেই বহুল পরিচিত



ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা *E. coli* নামক ব্যাকটেরিয়া

রাজ্য-২: প্রোক্যারিওটা বা আদিকোষী। যেসব অণুজীবের কোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা সুগঠিত নয়, সেগুলোই এ রাজ্যের সদস্য। সুগঠিত কেন্দ্রিকা না থাকায় এগুলোর কোষকে আদিকোষ বলা হয়। উদাহরণ: ব্যাকটেরিয়া।

রাজ্য-৩: ইউক্যারিওটা বা প্রকৃতকোষী। যেসব অণুজীব কোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা সুগঠিত, সেগুলোকে প্রকৃত কোষ বলে। উদাহরণ: শৈবাল, ছত্রাক ও প্রোটোজোয়া এ ধরনের অণুজীব।



মাইক্রোস্কোপে দেখা ইস্ট, বেকিংসহ নানা কাজে ব্যবহৃত হয় এই অণুজীব

কিছু সাধারণ অণুজীবের পরিচয়

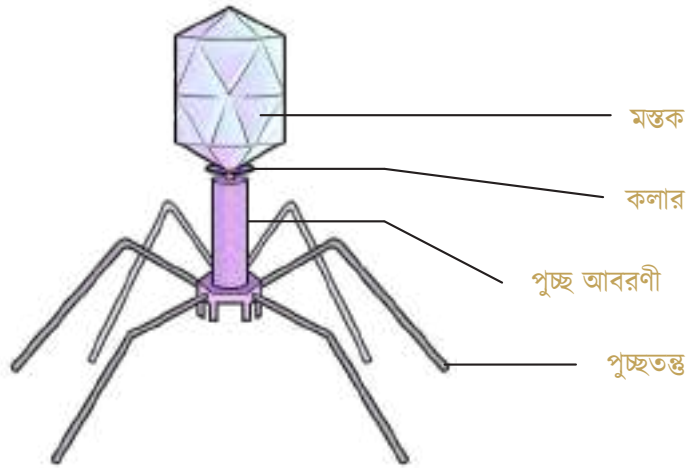
ভাইরাস, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি ধরনের অণুজীব আমাদের পরিবেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলো অধিকাংশই আমাদের উপকার করে। তবে কিছু কিছু অণুজীব আছে, যেগুলো আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে। এবার আমরা কয়েকটি অণুজীব সম্পর্কে জানব।

ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া

ভাইরাস

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ভাইরাসকে দেখা যায় না। ভাইরাসকে অণুজীব হিসেবে বিবেচনা করলেও এগুলোর আসলে স্বাধীন জীবন নেই। পরিবেশে এগুলো থাকে নির্জীব কণা হিসেবে। কিন্তু অন্য কোনো জীবের কোষে প্রবেশ করার পর ভাইরাস জীবের মতো আচরণ করতে পারে। ভাইরাসের দেহে কোষপ্রাচীর, সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম ইত্যাদি কিছুই নেই। তাই ভাইরাস দেহকে অকোষীয়ও বলা হয়। এগুলো শুধু আমিষ (প্রোটিন) আবরণ ও নিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ বা আরএনএ) নিয়ে গঠিত। এগুলোর আমিষ আবরণ থেকে নিউক্লিক অ্যাসিড বের হয়ে গেলে এগুলো জীবনের সকল লক্ষণ হারিয়ে ফেলে। তবে অন্য জীবকোষে প্রবেশের পর যখনই সেগুলো প্রোটিন আবরণ ও নিউক্লিক অ্যাসিডকে একত্র করতে পারে, তখন এগুলো জীবনের সব লক্ষণ ফিরে পায়। অর্থাৎ জীবিত জীবদেহ ছাড়া বা জীবদেহের বাইরে এগুলো জীবনের কোনো লক্ষণ দেখায় না। এ কারণে ভাইরাস প্রকৃত পরজীবী।

ভাইরাসের মধ্যে ব্যাকটেরিওফাজ ভাইরাস একটি পরিচিত ভাইরাস। যেসব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ভক্ষণ করে, সেগুলোই হলো ব্যাকটেরিওফাজ। এগুলো ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশের পর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে। চিত্রে এগুলোর গঠন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো।



একটি সাধারণ ব্যাকটেরিওফাজ ভাইরাস

ভাইরাস গোলাকার, দণ্ডাকার, ব্যাঙাচির মতো ইত্যাদি আকৃতির হতে পারে। তবে ভাইরাসবাহিত রোগ বলতেই এই মুহূর্তে সবার আগে যে রোগটির কথা চলে আসে তা হলো কোভিড-১৯, যা প্রচলিত ভাষায় ‘করোনা’ নামেই পরিচিত। করোনাভাইরাস আবার বিভিন্ন ধরনের হয়, এরকম একটি ধরণ হলো SARS-CoV-2 যা মূলত কোভিড-১৯ রোগের জন্য দায়ী। কোভিড-১৯ হলে কী ধরনের উপসর্গ হয় তোমরা সবাই ইতোমধ্যে জানো। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছড়ায় এই রোগ, আক্রান্ত রোগীর সাধারণ সর্দিকাশি

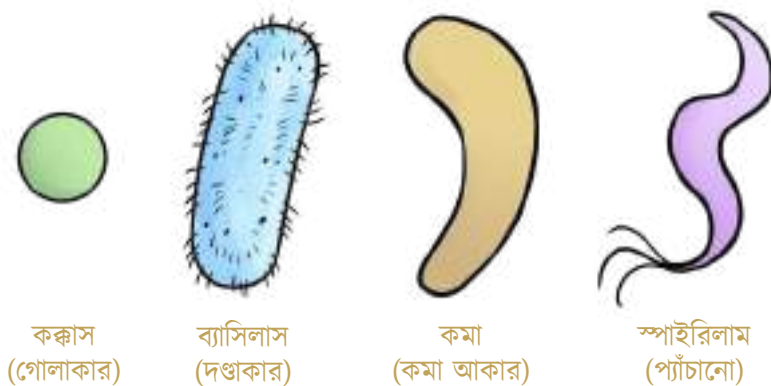
থেকে শুরু করে ফুসফুসের জটিলতর সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি গত কয়েক বছরে সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে এই বিশেষ ধরনের করোনাভাইরাস।

ভাইরাস শুধু মানুষের জন্যেই বিপদ ডেকে আনে, তা নয়। মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী ছাড়াও উদ্ভিদের অনেক রোগের জন্যেও দায়ী বিভিন্ন ভাইরাস; যেমন- ধানের টুংরো ও তামাকের মোজায়েক রোগ ভাইরাসের কারণে হয়।

এপর্যন্ত পড়ে মনে হতে পারে যে প্রকৃতিতে শুধুই রোগ দুর্ভোগ ডেকে আনা ছাড়া ভাইরাসের আর কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু কথাটা সত্য নয়, বরং প্রকৃতিতে ভারসাম্য রক্ষার জন্য অন্য সব জীবের মতো ভাইরাসেরও প্রয়োজন। সত্যি বলতে পৃথিবীতে বাস করা অসংখ্য ভাইরাসের মধ্যে খুব কম ভাইরাসই আমাদের রোগের কারণ ঘটায়।

ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়ার কিছু কথা আমরা আগের শ্রেণিতে জেনেছি। এবার একটু বিস্তারিত জানব। ব্যাকটেরিয়া হলো আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত, অসবুজ, এককোষী অণুবীক্ষণিক জীব (অর্থাৎ এগুলোর অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না)। বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ফন লিউয়েন হুক সর্বপ্রথম অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়া দেখতে পান। ব্যাকটেরিয়া কোষ গোলাকার, দণ্ডাকার, কমা আকার, প্যাঁচানো ইত্যাদি ধরনের হতে পারে। ব্যাকটেরিয়ার আকার-আকৃতির ভিত্তিতে এগুলোকে নিম্নরূপে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়:



বিভিন্ন আকৃতির ব্যাকটেরিয়া

ক) কক্কাস (Coccus): কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতি গোলাকার। এগুলো কক্কাস ব্যাকটেরিয়া। এগুলো এককভাবে অথবা দল বেঁধে থাকতে পারে, যেমন- নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, যেগুলোকে নিউমোকক্কাস বলা হয়।

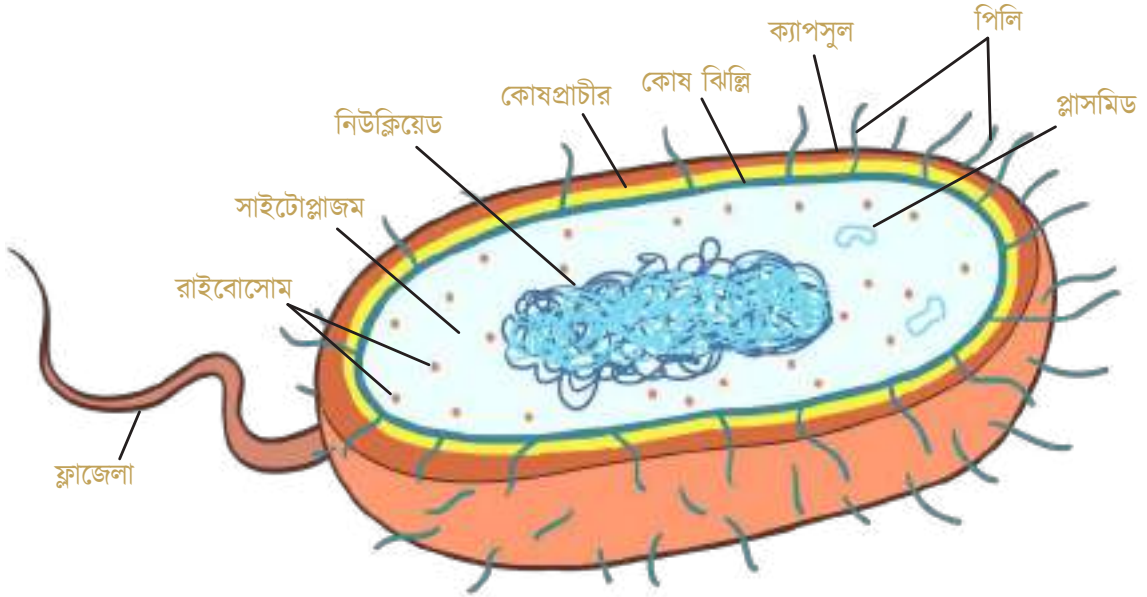
খ) ব্যাসিলাস (Bacillus): এরা দেখতে লম্বা দণ্ডের ন্যায়। ধনুষ্টংকার, রক্ত আমাশয় ইত্যাদি রোগ এরা সৃষ্টি করে।

গ) কমা (Comma): এগুলো বাকা দণ্ডের মতো আকৃতির ব্যাকটেরিয়া। মানুষের কলেরা রোগের ব্যাকটেরিয়া এ ধরনের।

ঘ) স্পাইরিলাম (Spirillum): এ ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি প্যাঁচানো। হাঁদুরের কামড় থেকে অনেক সময় এ ধরনের ব্যাকটেরিয়া আমাদের শরীরে ঢুকে জ্বরসহ বিভিন্ন উপসর্গ তৈরি করে।

ব্যাকেরিয়া সরল আণুবীক্ষণিক জীব হলেও সেগুলোর কিন্তু একটি সুগঠিত কোষীয় গঠন রয়েছে। এসব কোষের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রকৃতকোষী বা অকোষীয় অন্য জীবে পাওয়া যাবে না।

ব্যাকটেরিয়া আদিকোষী জীব। এর অর্থ, এসব কোষের নিউক্লিয়াস (Nucleus) বা কেন্দ্রিকা সুগঠিত নয়। কোষবিজ্ঞান অধ্যায়ে আমরা জেনেছি, একটি আদর্শ নিউক্লিয়াসের নিজস্ব পর্দা থাকে, যা নিউক্লিয়াসটিকে কোষের অন্য অংশ থেকে পৃথক করে রাখে। কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। সেগুলোর মূল নিউক্লিয়ার বস্তু তথা ডিএনএ (DNA) কোষের প্রোটোপ্লাজমে অবস্থান করে। এগুলোকে নিউক্লিয়েড (Nucleoid) বলা হয়।



ব্যাকটেরিয়ার কোষীয় গঠনের একটি সাধারণ চিত্র।

আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ব্যাকটেরিয়ার কোষে সেগুলোর মূল নিউক্লিয়ার বস্তু ছাড়াও বৃত্তাকার এক বা একাধিক ডিএনএ দিয়ে তৈরি গঠন থাকে। এগুলোকে বলা হয় প্লাসমিড (Plasmid)। আমরা জেনেছি যে নিউক্লিয়াস কোষের সব ক্রিয়া বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এটি সে করে ডিএনএ-এর মাধ্যমে। ডিএনএর মধ্যে তো সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করার অনেক তথ্য, আলাদা আলাদা তথ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিএনএর আলাদা আলাদা যে অংশ কাজ করে সেগুলোকে জিন বলে। প্লাসমিডের মধ্যেও কিছু জিন থাকে। উপরের ক্লাসে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানব, আপাতত জেনে রেখো যে জিন ডিএনএ একটি অংশ যা জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।

প্লাসমিডে অবস্থিত জিন থেকে এমন কিছু প্রোটিন তৈরি হয়, যেগুলো ব্যাকটেরিয়াকে নানান বৈশিষ্ট্য ও সক্ষমতা প্রদান করে। যেমন ব্যাকটেরিয়ার শত্রু হচ্ছে ভাইরাস। প্লাসমিডে থাকা জিন ভাইরাসের মতো

শত্রুর মোকাবেলা করে। এছাড়া ব্যাকটেরিয়াকে মারার জন্য আমরা যেসব ওষুধ ব্যবহার করি, সেগুলোর বিরুদ্ধেও প্লাসমিড ভূমিকা রাখে।

তোমরা হয়তো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic engineering)-নামে জীববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার নাম শুনে থাকবে। জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে যে জিন, সেগুলোর ভেতরে পরিবর্তন এনে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব তৈরির বিষয়টি বিজ্ঞানীদের জন্য সম্ভব করেছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিকাশে প্লাসমিড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ডিএনএ ছাড়াও ব্যাকটেরিয়ার কোষের ভেতর অন্যান্য জীবকোষের মতোই মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোসোম, গলজি বডি, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি অঙ্গাণু থাকে।

ব্যাকটেরিয়ায় কোষপ্রাচীর থাকে। তবে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য কিছু ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরের উপরে আরো একটি আবরণ থাকে। একে ক্যাপসুল (Capsule) বলা হয়। ক্যাপসুল মূলত শর্করা (Polysaccharide)-র আবরণ, যা সহজে ভেদ করা যায় না। যেসব ব্যাকটেরিয়ায় ক্যাপসুল আবরণ থাকে, সেগুলোর সংক্রমণে আমাদের অসুখ বিসুখ হলে এর চিকিৎসা তুলনামূলকভাবে কঠিন হয়। কারণ, আমরা যেসব ওষুধ খাই, তাকে ব্যাকটেরিয়ার কোষের ভেতর ঢুকতে বাধা দেয় এই ক্যাপসুল আবরণ।

ব্যাকটেরিয়ার চলাচল সহযোগিতা করার জন্য কোষপ্রাচীরের সঙ্গে ফ্লাজেলা (Flagella) নামের সুতার মতো অসংখ্য বিস্তারণ (Extension) থাকে। এগুলোর নড়াচড়ার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া জলীয় পরিবেশে চলাচল করতে পারে।

ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা

ব্যাকটেরিয়া আমাদের অনেক রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে, এটা সত্যি। কিন্তু সেগুলোর অনেক উপকারী ভূমিকাও আছে। যেমন:

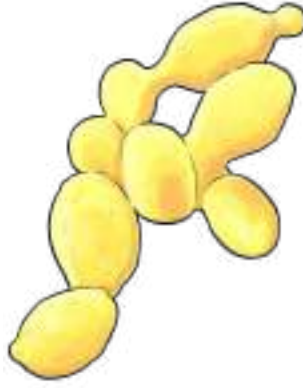
- বিভিন্ন জীবন রক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotic) ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয়।
- একমাত্র ব্যাকটেরিয়াই প্রকৃতি থেকে মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন (Nitrogen fixation) করে। পরিবেশের নাইট্রোজেন সাধারণত নিষ্ক্রিয় থাকে, সহজে কোনো যৌগ গঠনে অংশ নেয় না। সংবন্ধকরণ প্রক্রিয়া নাইট্রোজেন অণুকে বিক্রিয়াযোগ্য করে তোলে। এর ফলে মাটির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায়।
- পাট থেকে আঁশ ছাড়াতে ব্যাকটেরিয়া সাহায্য করে।
- দই তৈরি করতে ও ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নিতে হয়।

ছত্রাক, শৈবাল ও অ্যামিবা

ছত্রাক

ছত্রাক ক্লোরোফিলবিহীন অসবুজ জীব। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ক্লোরোফিল একটি অতি প্রয়োজনীয় জৈব অণু যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং উদ্ভিদকে সূর্যালোক থেকে

শক্তি সংগ্রহে সাহায্য করে। এক সময়ে ছত্রাককে অসবুজ উদ্ভিদ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এগুলোকে উদ্ভিদ থেকে আলাদা বিবেচনা করা হয়। ক্লোরোফিলের অভাবে এগুলো সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে না। তাই অন্য জীব বা জীবের অংশবিশেষের ওপর নির্ভর করে খাদ্যগ্রহণ করে (পরভোজী বৈশিষ্ট্য) অথবা মৃতজীবের অবশিষ্ট জৈববস্তু থেকে সেগুলো পুষ্টি গ্রহণ করে (মৃতজীবী বৈশিষ্ট্য)। পরভোজী ছত্রাক বাসি ও পচা খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল, শাকসবজি, ভেঁজা রুটি বা চামড়া, গোবর ইত্যাদিতে জন্মায়। মৃতভোজী ছত্রাক মৃত জীবদেহে বা জৈব পদার্থসমৃদ্ধ মাটিতে জন্মায়।



ঈস্ট



এগারিকাস

ছত্রাকের আকার আণুবীক্ষণিক কিংবা বৃহৎ হতে পারে। রুটি ফোলানোর কাজে ব্যবহার করা ঈস্ট কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়। সাধারণভাবে ব্যাঙের ছাতা নামে পরিচিত এগারিকাস বেশ বড় হয় এবং আমরা সেগুলোকে সহজেই দেখতে পাই।

ছত্রাকে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে।

এগুলোর কোষপ্রাচীরে কাইটিন নামের বিশেষ উপাদান থাকে যা সেগুলোকে বাইরের প্রতিকূল পরিবেশ থেকে বা অন্য জীবাণুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়।

ছত্রাকের উপকারিতা

ছত্রাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অণুজীব। পেনিসিলিন (Penicillin) নামের অ্যান্টিবায়োটিকের নাম হয়তো অনেকেই শুনে থাকবে। অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে এমন ওষুধ যা সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং নামের একজন বিজ্ঞানী পৃথিবীর প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন পেনিসিলিয়াম (Penicillium) নামের এক ধরনের ছত্রাক থেকে।

পাঁউরুটি তৈরিতে ঈস্ট (Yeast) নামের ছত্রাক ব্যবহার করা হয়। কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ঈস্ট দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং এর ফলে যে শ্বাসক্রিয়া হয়, তার থেকে সৃষ্ট প্রচুর পরিমাণের কার্বন ডাইঅক্সাইডের বদবুদ আটার খামিরে ভরে যায়, তাই খামিরের আয়তন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ খামির ফুলে যায়। তাই আমরা যে পাউরুটি খাই তা যথেষ্ট নরম হয়। ঈস্ট ভিটামিনসমৃদ্ধ বলে ট্যাবলেট হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। এগারিকাস (Agaricus) নামক এক ধরনের মাশরুম মজাদার খাদ্য বলে বিবেচিত। বর্তমানে আমাদের দেশসহ বহু দেশে এর চাষ করা হয়। আবর্জনা পচিয়ে মাটিতে মিশিয়ে জৈব সার তৈরিতেও ছত্রাকের বড় ভূমিকা রয়েছে।

ছত্রাকের অপকারিতা

অনেক রকমের ছত্রাক রয়েছে যেগুলো মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের অনেক রোগের জন্য দায়ী। দাদ, ছুলি (ছোলম) ও মানুষের শ্বাসনালির সংক্রমণে ছত্রাকের ভূমিকা থাকে। ছত্রাক আলু, পাট, আখ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ফসলের রোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া এ ছত্রাক সহজেই কাঠ ও বেত বা বাঁশের আসবাবপত্র পচিয়ে ফেলে।

ছত্রাক সংক্রমণ প্রতিরোধকরণ

ছত্রাকজনিত রোগ খুবই ছোঁয়াচে। অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। এসব রোগ থেকে নিরাপদ থাকতে যা করা দরকার তা হলো:

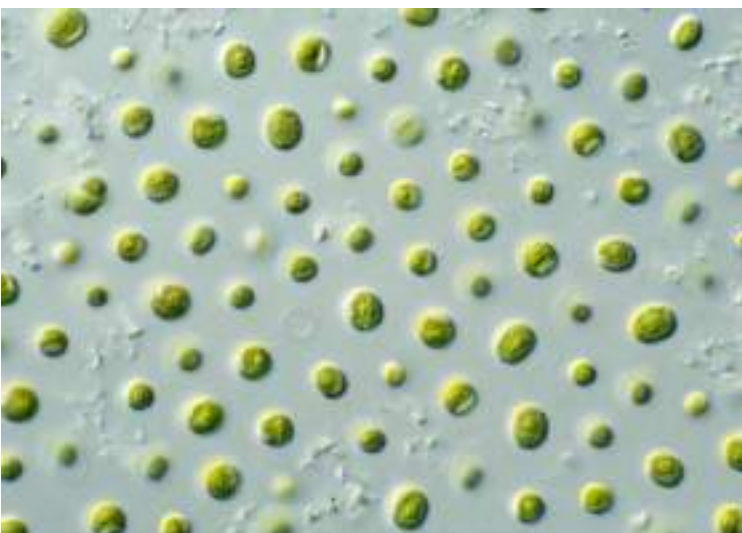
- ছত্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্র (কাপড় চোপড়, চিরুনি, টুপি, স্যাভেল) ব্যবহার না করা।
- ছত্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে কম আসা।
- ছত্রাক আক্রান্ত উদ্ভিদে ওষুধ ছিটানো বা উদ্ভিদ তুলে পুড়িয়ে ফেলা।

শৈবাল

ক্লোরোফিলযুক্ত ও স্ব-ভোজী উদ্ভিদসদৃশ জীব হচ্ছে শৈবাল। শৈবালকে পুরোপুরি উদ্ভিদ হিসেবে গণ্য করা যায় না, কারণ, সেগুলোর মূল, কাণ্ড ইত্যাদি পুরোপুরি উদ্ভিদের মতো নয়। এরা মাটি, পানি ও অন্য গাছের উপর জন্মায়। সবুজ ও লাল, বাদামি ইত্যাদি রঙের শৈবাল দেখা যায়। আকার আকৃতির দিক থেকে শৈবালের বৈচিত্র্য অবাক করার মতো। কেবল অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্য ছাড়া



দৈত্যাকার কেব্ল যা সমুদ্রে জন্মায়।



কেবল অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে দেখা যায় এমন ক্ষুদ্র শৈবাল।

দেখা যায় না এমন শৈবাল যেমন রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় Microalgae বা ক্ষুদ্র শৈবাল। অপরদিকে অনেক বৃহৎ শৈবাল রয়েছে যেগুলো সমুদ্রে জন্মায় এবং গড়ে ১০০ ফুটের মতো লম্বা হয়। এগুলোকে কেব্ল (Kelp) বলা হয়।

শৈবালের গঠন: শৈবাল এককোষী কিংবা বহুকোষী হতে পারে। অনেকগুলো কোষ মিলে এগুলো শিকলের মতো গঠন নিতে পারে। প্রায় উদ্ভিদের মতো দেখতে অনেক বড় শৈবালও রয়েছে। শৈবালের কোষে কোষপ্রাচীর থাকে।

এছাড়া এগুলোর নিউক্লিয়াস সুগঠিত। অর্থাৎ এগুলোর নিউক্লিয়ার পর্দা দ্বারা নিউক্লিয়াসটি কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক থাকে। শৈবালে ক্লোরোপ্লাস্ট এবং মাইটোকন্ড্রিয়া অঙ্গাণুও থাকে।

শৈবালের উপকারিতা: শৈবাল অত্যন্ত উপকারী অণুজীব। আইসক্রিম তৈরিতে সামুদ্রিক শৈবালজাত উপাদান অ্যালজিন ব্যবহৃত হয়। সামুদ্রিক শৈবাল আয়োডিন ও পটাশিয়ামের একটি ভালো উৎস। মাছ চাষে শৈবাল খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্পিরুলিনা (Spirulina) নামক শৈবাল বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়, যা প্রোটিনসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদানে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

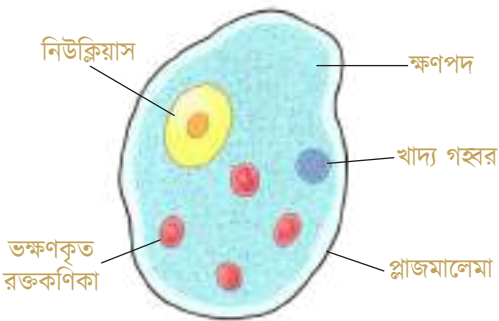
শৈবালের অপকারিতা: মানুষ ও উদ্ভিদের নানা রোগ সৃষ্টিতে শৈবাল দায়ী। যেমন এক ধরনের শৈবাল চাপাতার রেড রাস্ট রোগ সৃষ্টি করে। জলাশয়ে শৈবালের আধিক্য দেখা দিলে জলজ প্রাণী ও মাছ অক্সিজেনের অভাবে মারা যেতে পারে। শৈবালের বিষ দ্বারা বিষাক্ত সামুদ্রিক খাবার খেয়ে প্রতিবছর অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

অ্যামিবা

প্রোটিস্টা রাজ্যের সদস্য অ্যামিবা এককোষী প্রাণী। এগুলোর দেহ ক্ষুদ্রাকার। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এগুলোকে দেখা যায় না। অ্যামিবা প্রয়োজনে দেহের আকার পরিবর্তন করে থাকে। এগুলোর দেহ থেকে আঙুলের মতো তৈরি অভিক্ষেপকে ক্ষণপদ বলে। এর সাহায্যে অ্যামিবা খাদ্য গ্রহণ ও চলাচল করে। এদের সারা দেহ একটি পাতলা ও স্বচ্ছ পর্দা দ্বারা ঘেরা থাকে, একে প্লাজমালেমা বলা হয়। অ্যামিবা পানিতে, স্যাঁতসেঁতে মাটিতে, পুকুরের তলার পচা জৈব আবর্জনার মধ্যে জন্মে।



একটি অ্যামিবা। ছবিতে ক্ষণপদ ও কোষের ভেতরের খাদ্য গহ্বর বিশেষভাবে লক্ষণীয়।



আমাদের অস্ত্রে পাওয়া এন্টামিবা। এন্টামিবার মতো এদেরও ক্ষণপদ ও খাদ্যগহ্বর থাকে। তবে সেগুলোর ভেতরে মানুষের অস্ত্র থেকে ভক্ষণ করা রক্তকণিকাও পাওয়া যায়।

এন্টামিবা

এন্টামিবা (Entamoeba) প্রোটিস্টা রাজ্যভুক্ত আরেক ধরনের এককোষী জীব। খালি চোখে এগুলোকে দেখা যায় না। এগুলোর দেহের কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নেই, কারণ এরাও সর্বদাই অ্যামিবার মতো আকার ও আকৃতি পরিবর্তন করতে থাকে। এগুলোর দেহ স্বচ্ছ জেলির মতো। তবে কখনো কখনো প্রতিকূল পরিবেশে এগুলো গোলাকার শক্ত আবরণে নিজেদের দেহ ঢেকে ফেলে। এ অবস্থায় একে সিস্ট (Cyst) বলে।

আমিবা পরজীবী হিসেবে মানুষ, বানরজাতীয় প্রাণী, বিড়াল, কুকুর, শূকর ও ইঁদুরের বৃহদন্ত্র বাস করে। মূলত অ্যামিবার সঙ্গে এন্টামিবার মূল পার্থক্য হচ্ছে, সেগুলোর এই আবাস। অ্যামিবা স্বাদু পানিতে মুক্ত জীব হিসেবে অবস্থান করে। কিন্তু এন্টামিবা অন্য জীবের ভেতর আন্ত্রিক পরজীবী হিসেবে বাস করে। এগুলো মানুষের এক ধরনের আমাশয় রোগের জন্য দায়ী।

এন্টামিবা কোষ বিভাজন ও অণুবীজ (স্পোর) সৃষ্টির মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। যে পদ্ধতিতে একটি স্পোর বা অণুবীজ বহুখণ্ডে বিভাজিত হয়, তাকে স্পোরুলেশন বলে। এন্টামিবা কোষের প্রোটোপ্লাজম বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুবীজ বা স্পোর গঠন করে।

স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টিতে অণুজীবের ভূমিকা

মানুষ ও অন্যান্য জীবের অনেক অসুখ বিসুখের কারণ হচ্ছে অণুজীব। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক আমাদের শরীরে প্রবেশ করে আমাদের অসুস্থ করে। ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে পারে। অপরিষ্কার হাত জীবাণুর জন্য একটি সুবিধাজনক বাহন। যার মাধ্যমে সহজেই এগুলো মুখগহ্বরে ঢুকে যেতে পারে। আমরা যে জামা কাপড় ব্যবহার করি তাতে লেগে ব্যাকটেরিয়ার স্পোর স্থানান্তরিত হতে পারে।

বাতাসে যে ধূলাবালি উড়ে বেড়ায় তার সঙ্গে অতি সহজেই ব্যাকটেরিয়া বা তার স্পোর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। হাত মেলানোর মাধ্যমেও ব্যাকটেরিয়া একজন থেকে অন্যজনে অতি সহজে স্থানান্তরিত হতে পারে। পচা ও বাসি খাদ্যের মাধ্যমে জীবাণু সহজেই ছড়ায়।

আমাদের দেশে প্রতিবছরই প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হয় কলেরা ও টাইফয়েড রোগে। এগুলো ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। ব্যাকটেরিয়ার বাইরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর রূপ আবির্ভূত হয় ভাইরাস। যেমন, এইডস নামক রোগ হয় এইচআইভি ভাইরাসের কারণে। আবার ২০২০ সালে সারা পৃথিবীতে কোভিড-১৯ অতিমারি ছড়িয়েছিল সার্স-কোভি-২ নামক ভাইরাসের মাধ্যমে। মাম্পস, হাম, বসন্ত ইত্যাদিও খুবই কষ্টকর ভাইরাসজনিত রোগ। ভাইরাসজনিত এসব রোগ হাঁচি, কফ, থুতু ও কাশির মাধ্যমে সর্দি-কাশির মাধ্যমে বাতাসে প্রবাহিত হয়ে ছড়ায় এবং আমাদের শ্বাসনালিতে প্রবেশ করে।

ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে অনেক সময় ২/৪ দিনে এমনি রোগ সেরে যায়। তবে কিছু মারাত্মক রোগ আছে যার জন্য দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এইডস রোগ একবার হলে আর নিরাময় হয় না। অসুস্থ লোকের রক্ত গ্রহণ, মাদক গ্রহণ, এক সুই-এ বহু লোকের ইনজেকশন গ্রহণ ও অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক থেকে এ রোগ ছড়ায়। ডেঙ্গু জ্বর, কোভিড-১৯ ইত্যাদি রোগও অনেক মানুষের মৃত্যুর কারণ।

একটা সময় ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও এন্টামিবাজনিত রোগ খুবই ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে যেত। নিরাপদ পানির অভাবে এমন হতো। যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগের কারণেও জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়। এসব মল-মূত্রে যে জীবাণু থাকে তা ভক্ষণকারী অন্য জীব এগুলোকে ছড়িয়ে দেয়। এছাড়া বৃষ্টি বা জোয়ারের পানিতে এগুলো দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। পরিবেশ পরিষ্কার রাখার মাধ্যমে এবং সঠিক স্বাস্থ্য বিধি মেনে চললে আমরা এসব রোগব্যাধির অনেকগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারি। নিচে আমরা এ সম্বন্ধে আরো জানব।

মানবদেহে অণুজীব সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রতিরোধ ও প্রতিকার

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও এন্টামিবা যেসব রোগ সৃষ্টি করে তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে হলে সম্মিলিতভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলো যত্ন সহকারে পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, দুর্বল স্বাস্থ্যের ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি বহন করে। তাই সকলের উচিত সুস্বাদু খাদ্য প্রয়োজন মতো নিয়মিত গ্রহণ করা।

আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার্য কোনো কিছু ব্যবহার বা স্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত। খাবার পানি নিরাপদ হওয়া খুবই জরুরি। কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট রোগ থেকে বাঁচতে অবশ্যই নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে। পান করা, গোসল ও কাপড় কাচা, বাসন ধোয়া ইত্যাদির জন্য নিরাপদ পানি ব্যবহার করা উচিত। আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েলের পানি নিরাপদ। পুকুর ও নদীর পরিষ্কার পানিও ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। মানুষ ও পশু-পাখি আক্রান্ত হলে সেগুলোর চিকিৎসা করাতে হবে।

অণুজীব দ্বারা সৃষ্ট রোগ-ব্যাদিকে প্রতিরোধ করতে হলে এলাকার সবাইকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে হবে। কীভাবে এসব জীবাণু মানবদেহে ঢুকে পড়ে এবং কী করলে এগুলোকে প্রতিরোধ করা যাবে সে সম্পর্কে নিজে ভালোভাবে জানতে হবে। বিদ্যালয়ে, মসজিদে, মন্দিরে, খেলার মাঠে, হাটে, বাজারে, যেখানে লোকসমাগম বেশি সেখানেই এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করা যায়। এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ। রোগাক্রান্ত হলে অবশ্যই রোগীকে একজন ভালো চিকিৎসকের নিকট গিয়ে পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ সেবন করতে হবে। গ্রামে থাকা কমিউনিটি ক্লিনিক বা উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে অনেক চিকিৎসাসেবা ফ্রি পাওয়া যায়। এসব সেবা গ্রহণ করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে অনুমোদিত হাসপাতাল এবং সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা নেওয়ার। গ্রামে বা পাড়া-মহল্লার হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগ নিরাময়ের বদলে রোগ জটিল স্তরে পৌঁছে যায়। এ ব্যাপারে সচেতন থাকা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

জীবের ভেতর বসত করা অণুজীব

যদি বলা হয়, তোমার শরীরে তোমার নিজের কোষের সংখ্যার চেয়েও বেশি সংখ্যক অণুজীব বাস করে, তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সেটা বিশ্বাস করতে চাইবে না। আসলেই কিন্তু তথ্যটা সত্যি। আমাদের শরীরের ভেতর অনেক অণুজীবের বসবাস। আমাদের পাকস্থলী, ত্বকের নিচে, শরীরের নানা অঙ্গ এগুলোর আবাসস্থল। এগুলো আমাদের নানাভাবে প্রভাবিত করে। যেমন আমাদের পরিপাকতন্ত্রে থাকা কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়া আমাদের পরিপাকতন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষা করে, আমাদের খাবার সঠিকভাবে হজম করতে ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন যে, পরিপাকতন্ত্রের এসব ব্যাকটেরিয়া থেকে বের হওয়া রাসায়নিক সংকেত আমাদের মস্তিষ্কের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে।

শুধু মানুষ নয়, উদ্ভিদের ভেতরেও কিন্তু ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক থাকে। এরকম একটি চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে এন্ডোফাইট (Endophyte)। এন্ডোফাইট হচ্ছে এমন সব ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক যেগুলো উদ্ভিদের কোষের ভেতর বিশেষ ক্ষতি করা ছাড়া বসবাস করে। বেশির ভাগ সময় উদ্ভিদকোষের ভেতর অণুজীবের এই সহাবস্থান সেগুলোর উভয়ের জন্য উপকারী হয়, তবে কখনো কখনো তা উদ্ভিদের জন্য প্রায় ক্ষতিকর

পরিণতিও ডেকে আনতে পারে।

প্রায় সকল উদ্ভিদের ভেতরেই এন্ডোফাইট থাকে। এসব এন্ডোফাইট বিভিন্ন ধরনের জৈব-রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে। তোমরা নিশ্চয়ই অ্যান্টিবায়োটিকের নাম শুনে থাকবে। উদ্ভিদের ভেতর বসবাসকারী অনেক এন্ডোফাইট বিভিন্ন রকম অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করে। এসব বিষয়ে এখনো অনেক কিছু আমাদের অজানা। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে অনেক গবেষণা করছেন, তোমরা জেনে খুশি হবে, বাংলাদেশেও এ রকম গবেষণায় এগিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হাসিনা খানের নেতৃত্বে একটি গবেষণায় হোমিকরসিন (Homicorcin) নামে একটি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হয়েছে পাটের ভেতর বসবাস করা ব্যাকটেরিয়া থেকে। তোমরা এ ধরনের গবেষণার আরো বিস্তারিত বড় হয়ে জানতে পারবে।

স্বপ্নশীলনী
?

১। শীতকাল থেকে গরমকালে দই তৈরি করা সহজ কেন?